Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 218 – 223
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

নির্মল দাশের গল্পে জীবনের টানাপোড়েন : একটি নিবিড় পাঠ

ড. প্রণব কুমার দাস
পি. জি. টিচিং ফ্যাকাল্টি
নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : pkdjayanta@gmail.com

Keyword
ত্রিপুরা, জীবনবোধ, জীবনশৈলী, লড়াই, সময়, সমস্যা, অস্তিত্ব, টানাপোড়েন, ইতিবাচক।

Abstract
ত্রিপুরায় সাহিত্য নিয়ে যারা দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন প্রতিভাধর লেখক হলেন ড. নির্মল দাশ। পেশায় তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হলেও, ব্যস্ততার ফাঁকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যচর্চা নিয়েই পড়ে থাকেন। তিনি বিশেষত ত্রিপুরার মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেছেন। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক, উত্তরপূর্বাঞ্চলের হাতে গোনা কয়েকজন লোকস্কৃতি গবেষকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সময়ের ধারার সঙ্গে চলতে গিয়ে তিনি ত্রিপুরার প্রকৃতি, জীবনশৈলী ও সমাজ ব্যবস্থাকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন, যার প্রমাণ তাঁর বহু সাহিত্য নিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পগুলি পড়লেও পার্বত্য ত্রিপুরার বৈচিত্র্যময় পরিবেশ ও জীবনবোধকে অনুভব করা যায়। তাঁর ছোটগল্পে ঘটনার ঘনঘটার জোর তেমন না থাকলেও একটি পরিকল্পিত দ্বন্দ্ব রয়েছে, যার ফলে পাঠকও জীবনের টানাপোড়েনের সঙ্গে গল্পের টানাপোড়েনের অনুসন্ধানে সচেতনভাবে গল্পপাঠে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

নির্মল দাশের গল্পপাঠে একটি সহজ সরলাতার আভাস পরিলক্ষত হয়। বাস্তব ঘটনার সমাহারে কাহিনিগুলি তার পরিচিত গণ্ডীর ভেতরে থেকেও স্বতন্ত্র ও স্বাভাবিক। মানুষের নানা সমস্যা ও জটিলতাকে তিনি খুব নিবিড়তার সঙ্গে গল্পে বর্ণনা করেছেন। তাঁর গল্পে বিচিত্র কাহিনির সমাবেশে চরিত্রগুলি নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে প্রায়শই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একপ্রকার লড়াই করেছে, তাতে সর্বদা জয়ী হতে না পারলেও তারা ভেঙে পড়েনি। এই লড়াইয়ের মধ্যেও তাদের ইতিবাচক মানসিকতার স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে, কেননা এদের লড়াই ছিল সমাজের মহাশক্তিধর বিবেকহীনদের বিরুদ্ধে অথবা রূঢ় বাস্তবতার বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে গল্পকারের সদর্থক ভাবনা ও সময়ের প্রবাহে বিবর্তিত জীবনের নানা পর্যায়কে তিনি যেভাবে দেখে এসেছেন, তাকে সেভাবেই লিখে চলেছেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, শিল্প ও সংস্কৃতি পর্যটকদের বরাবরই আকর্ষণ করে আসছে। সেইসঙ্গে এখানকার মাটি ও মানুষের ইতিহাস এবং সাহিত্য পর্যবেক্ষণ গতিময় ও সৃষ্টিশীল। স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ, বঙ্গভঙ্গের আঘাত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চাপানউতোর, আশি সালের দাঙ্গার দাগ, বিচ্ছিন্ন উগ্রপন্থার কালোদিনের সেই সব দাগ এখনো স্থানীয়দের নস্টালজিক করে তুলে। এত কিছুর পরেও ত্রিপুরাবাসী তার নিজস্বতা হারায়নি। ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আজও ভ্রাতৃত্ববোধ, আপ্যায়ন ও রুচিশীল সাহিত্য-শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ড. নির্মল দাশের গল্পগুলির ভেতরেও এই সব লড়াকু মানুষদের জীবন যন্ত্রণার কথা, বিশেষত গ্রামীণ মানুষদের সরলতা, ধর্ম বিশ্বাসের কথা, শহরের অনৈতিক কর্মকাণ্ড, তাদের মূল্যবোধহীন চলাফেরা, সমাজের বিভিন্নস্তরে ঘটমান ষড়যন্ত্রের পরও তাদের টিকে থাকার কথা উঠে এসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে লেখকের নির্বাচিত কয়েকটি গল্প অবলম্বনে লেখা।

Discussion

হোম মিনিস্টার :

গল্পের কাহিনিটি এতটা জটিল নয়, রমেশ ও অমিতার সুখের সংসারের টানাপোড়েন নিয়েই তৈরি। রমেশের বাড়িতে তার স্ত্রীর কথাটিই বেশি চলে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমেশ ও তার ছেলেমেয়েরা মায়ের ভয়ে সরবদা তটস্থ। গল্পের শুরুতেই দেখি অমিতার দাঁত ব্যথার জন্য বহুদিন পর রমেশ কিছুটা সস্থির নিশ্বাস নিচ্ছে। সে মনে মনে ভাবে যাক, স্ত্রীর গর্জনটা কিছুটা কমেছে। তবে একথা সত্য দাঁত ব্যথার কারণে অমিতা কিছু না বললেও নিজের রাগ ও অভিমানকে ঠিকই নানা ইশারায় প্রকাশ করে চলেছে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা ও অভিমানের মেলবন্ধনে গল্পটি বেশ জমে উঠেছিল। এমন সময় দুটি চিঠি আসায় গল্পের সাধারণ গতিটি অন্যদিকে মোড় নেয়। একটি চিঠি অনিতাকে কেন্দ্র করে ও অন্যটি রাধা লিখেছে। এই দুইজনের প্রতি রমেশের একটা আলাদা রকমের টান রয়েছে। যার কিছুটা আভাস অমিতা আগে পেয়েছিল, যার ফলে অমিতা রমেশকে বরাবরই আগলে রাখতে চেয়েছে।

অনিতা রমেশের শ্যালিকা হওয়ায় তাদের মধ্যে একটা পরিচিতি ছিল ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠার সুযোগও ছিল, কিন্তু স্ত্রীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কারণে তা হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে রাধার সঙ্গে তার প্রণয়ের সুরটি এতকাল চাপা থাকলেও আবার একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে মনের গভীরে জেগে উঠতে চাইছে। রমেশ এর কোনো সঠিক সমাধান ভাবতে পারে না। একদিকে সংসারের ধর্ম, অন্যদিকে সময়ের স্রোতে ভুলতে বসা প্রণয়ের টান, উভয়ের যে বিরোধ তাকে কাটিয়ে উঠার ইতিবাচক দিকটিকে লেখক আলোচ্য গল্পে বর্ণনা করলেন। শেষ পর্যন্ত সে বহু বছর পর স্বপরিবারে অনিতার বিয়েতে যোগ দিতে রওনা হয়। নতুন করে সে আর কোনো সম্পর্কে জড়াতে রাজি নয়। বরং পরকীয়ার হাতছানিকে অস্বীকার করে পরিবার নিয়ে সুখে থাকতে চেয়েছে।

> "অনিতা আর রাধা দুজনের টানে রকমফের আছে। একসময় অনিতার প্রতি টান অনুভব করেছে। আবার রাধাও টেনেছে।"[১]

চক্রব্যূহ :

> "সম্প্রাই ভাবে, তাঁর কাঁধে মরণাস্ত্রটির এক হুঙ্কার থেকে যদি গন্ধময় গোলাপ উপহার দিতে পারত এই পৃথিবীকে।"[২]

১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বা এরও কিছুটা আগে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী একদল যুবকদের হাতে ভুল বুঝিয়ে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল সুবিধাবাদী কিছু গোষ্ঠী। তারা পর্দার আড়ালে থেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুবকদের উগ্রপন্থার পথে ঠেলে দিয়েছিল। সম্প্রাইয়ের মতো একেবারে সাধারণ যুবক নিজের প্রাণ বাজি রেখে এই ভয়াভয় পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ে। সে ভুল পথে পা দিয়ে নিজের সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়েছে। তাই সে কিছুটা

দ্বিধাগ্রস্থ। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সে যে ভুল করেছে, তাতে আর যাই হোক কখনোই সুস্থ সমাজজীবনে ফিরে আসতে পারবে না, একথা সে উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এখানকার মাটি, ফল, ফুল, বীজ, পাখি সবকিছুকেই সে ভালবাসে তাই সে মরণাস্ত্রের পরিবর্তে গোলাপ ফুল উপহার দিতে চেয়েছে। এভাবেই একজন লেখক তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর রাষ্ট্র নির্মাণের ভিতটি গড়ে তুলেন। এই উক্তির মধ্য দিয়ে সম্প্রায়ের মানবিক বোধের পরিচয়টি জানা যায়।

আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি সম্প্রাইয়ের আচরণে ও কথাবার্তায় কোনো অসংলগ্নতা নেই। সে আরো পাঁচজনের মতো করে ভাবতে পারে, স্বপ্ন দেখতে পারে। তাকেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট করে, চারপাশের গাছপালা, ফুলের গন্ধ মোহিত করে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি তার যে একটা দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে সে সচেতন। কিন্তু এই ভুল পথে পা বাড়িয়ে আজ সে সকল কিছু থেকে বঞ্চিত। তার আত্ম সচেতনবোধ তাকে ভেতর থেকে কষ্ট দিচ্ছে, আঘাত হানছে, কিন্তু তার কাছে বিকল্প কোনো রাস্তা খোলা নেই। তার ভালোবাসার মানুষটি (নকুতি) তাকে ছেড়ে চলে গেছে, একজন সাকার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সম্প্রাই বন্দুক হাতে যতটা না ভয়ঙ্কর, তার চেয়ে বেশি তার সহজ সরলতা। মিশন শেষ করে অনেক অনুরোধের পর সে একদিনের ছুটি নিয়ে মার কাছে ছুটে আসে। বাড়ির চেনা ছন্দে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে নিজেকে নতুনভাবে আবিস্কার করে, তার বর্তমান অবস্থা ও শোচনীয় পরিস্থিতি দেখে আঁতকে উঠে।

> "বিছানায় পড়ে থাকা ভাঙা দর্পণটি হাতে তুলে চুলে একবার হাত বুলায় সে। এ কোন সম্প্রাই। চমকে ওঠে সে। একটা হিংস্র হায়েনা, যার চোখে কুটিল চাহনি, রুক্ষ গালের চামড়ায় রোম গজিয়েছে অসংখ্য। শিকার ধরার আগে যে প্রস্তুতি, এটা যেন তাই।"[৩]

মুখোশ :

এই গল্পটির বিষয়ভাবনা চমৎকার। কিষেণের মতো নির্ভেজাল চরিত্র সমাজে রয়েছে প্রচুর। তারা নিজের বিষয়ে এতটা ওয়াকিবহাল নয়, অন্যের বিষয়েও নাক গলান না। তারা কোনোরকমে দুমুঠো খেয়ে শান্তিতে বেঁচে যেতে পারলেই খুশি। এদের চাহিদা কম। কিষেণের বাবা নিজের জমির একটা অংশ দান করে গেছেন আশ্রমের নামে। কিন্তু কালচক্রে সেই আশ্রম আর আগের অবস্থানে নেই, শুধু বাইরের দিক থেকে নয় ভেতরের দিক থেকেও এর অনেক কিছুরই বদল ঘটেছে। সত্যব্রত মহারাজ শিষ্য বিনয়ানন্দ মহারাজকে দায়িত্ব দিয়ে কোলকাতা হয়ে লণ্ডনে চলে গেছেন। বিনয়ানন্দের আমলেই আশ্রমের সীমানা ও ধন সম্পত্তি অনেক গুণ বেড়েছে। মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগকে হাতিয়ার করে তিনি আশ্রমটিকে একপ্রকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করিয়েছেন। আশ্রমের চারপাশের প্রতিটি বাড়িঘর বেদখল হয়ে যাচ্ছে, এখন কিষেন ও তার প্রতিবেশী সত্যদার জমির উপর নজর পড়েছে। তারা স্বেচ্ছায় সেই জমি দিয়ে দিলে তো ভালোই, নয়তো এর পরিণাম ভয়াবহ হবে। সমাজের এই বাস্তবিক দৃশ্যটি আমরা প্রতিনিয়তই দেখে লক্ষ্য করছি।

সমস্যা হচ্ছে কিষেনকে নিয়ে, সে এইসবের কিছুই বুঝতে চায় না, বুঝে উঠতে পারে না। বিনয়ানন্দ মহারাজ ইশারায় তাকে বুঝাতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার মতো অতি সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ষড়যন্ত্রের জালকে অনুভব করা মুশকিল। সে অফিসের সামান্য করণিক মানুষ। বাইরে তার হয়ে অফিসের বড় বাবু ভাবেন, ঘরে তার স্ত্রী সুধা ভাবেন। সে কারণেই গল্পে দেখি বড় মহারাজ অর্থাৎ সত্যব্রত মহারাজ আশ্রমে আসার আগেই তার ঘরবাড়ি কেঁড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রটি শেষ হয়ে যায়। তার স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে তাদের শেষ ঠিকানা কোথায় হবে সে বিষয়টি আগেই পাকা হয়ে গেছে। এখন তার মতামত জানানোর বা অনিচ্ছার কোনো রাস্তায় আর বাকি রইল না। তাই গল্পের পরিণতিতে তাকে নীরব থাকতে আমরা দেখি। গরীব লোকেদের কথা বলা বা প্রতিবাদ করার জায়গা কম, সে সাহসও তাদের নেই। যারা এর ব্যতিক্রম কিছু করতে চেয়েছে তারা পৃথিবী থেকেই চিরতরের জন্য হারিয়ে গেছে। কিষেন ও সত্যদার মতো বহু মানুষ প্রতিদিন নিরুপায় হয়ে বাড়ি-ঘর ফেলে শুধু প্রাণটাকে নিয়ে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। লেখক জীবন যন্ত্রণার এক নিদারুণ ছবি আঁকলেন।

> "কাল সকালে গাড়ি আসবে। মালপত্র যাবে। আমরাও যাবো। সত্যদার গাড়িও একই সঙ্গে যাবে। ওখানে ঘর ভাড়া করা আছে। এ ভাবে কি বাঁচা যায়, বলো?"[৪]

পরকীয়া :

গল্পটির নামের সঙ্গে কাহিনির গভীরতার মিল কিছুটা কম হলেও, বিচিত্র ভাবনার জন্য এর মূল্য অন্য জায়গায় অনেক বেশি। দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণে গল্পটি এগিয়েছে। একদিকে গ্রাম ও শহরের মানুষজনের মিল ও অমিলের জায়গাটি প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া পারিবারিক সম্পর্কগুলিকে দেখানো হয়েছে। সময়ের ধারায় জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুহূর্তগুলি কিভাবে প্রভাব ফেলে তা নির্ণেন্দু দেখে উপলব্ধি করা যায়। তার পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে যে সব চরিত্রগুলি রয়েছে তারা কে কিভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করেছে, তার দিকে সে সর্বদা সজাগ ছিল। তা সত্ত্বেও নির্ণেন্দুকে অপমানিত হতে হয়। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি যৌথ পরিবারের ভিতটি ভেঙে নির্ণেন্দু ও মহুয়া গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। গ্রামের খোলা মাঠ, কৃষিজমি তাকে আর আগের মতো আকৃষ্ট করে না। এর চেয়ে নগরের কোলাহল, নিয়ম মেনে অফিসে যাওয়া, সব কিছুর মধ্যে পরিকল্পিত জীবনটাই এখন তাদের বেশি পছন্দ। বিশেষ করে নির্ণেন্দুর স্ত্রীর কারণেই তাকে যৌথ সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। তা সত্ত্বেও নির্ণেন্দুর মন পরে থাকে নয়াগ্রামের সেই আত্মীয়পরিজনদের প্রতি।

সে মাঝে মধ্যে গ্রামে যায় মাটির টানে, স্বজনদের টানে। তাদের দেখে আসে, খোঁজ খবর নিয়ে আসে। বৌদিদের সঙ্গে আড্ডার আসরটাও জমে ভালো। সেইসঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে চাষবাস, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা হয়, যার ফলে তার দিনটি কাটে ভালো। ব্যস্ততম জীবনে এটাই বা কয়জনে করে উঠতে পারে। শহরের বদ্ধ জীবনের বাইরে এসে নির্ণেন্দু মুক্ত হাওয়ায় কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচে। যতটুকু সম্ভব সে আত্মীয়তার সম্পর্টিকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু পরিজনদের সবার খবর রাখা বা প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর পরেই গল্পটি অন্য দিকে বাঁক নেয়। অনেকদিন পর সে গ্রামে এলে তার মেজ বৌদি তাকে পিসিমার মৃত্যু সংবাদটি দেয়, তা শুনে সে বিস্মিত হয়। বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীকেও বিষয়টি জানায়। তারা দুজনই হতবাক এবং মনে মনে ব্যথিত হয়। এত বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল, অথচ কেউ তাদের জানাইনি। এই দুঃসংবাদটি নির্ণেন্দু চিঠি লিখে কোলকাতায় পিসির বড় ছেলেকে জানাই। কিন্তু সেখান থেকে চিঠির প্রত্যুত্তরে বলে, তারাও এই বিষয়ে কিছু জানে না। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই সে আরেকবার গ্রামে যায় প্রকৃত খবরটি জানতে। যে মেজ বোউদি খবরটি দিয়েছিল, তাকে নির্ণেন্দু জিজ্ঞেস করে আসলে ঘটনাটি কি? তখন তিনি জানালেন ব্যাপারটি ভুল বশত ঘটেছে। এই কথা শুনার পর নির্ণেন্দু মানসিকভাবে বড় ধাক্কা খায়। কারণ সে ভালো করেই জানে ছেলের কাছে মায়ের মিথ্যে মৃত্যু সংবাদটি পৌঁছে দিয়ে সে গর্হিত কাজ করেছে।

এই ভাবে সে তাদের কাছে ছোট হয়ে যাবে সেই কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই আর দেরি না করে এস টি ডি করে বড়দাকে পিসিমার বেঁচে থাকার সংবাদটি জানায়। জীবনে চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তে সময় যে শিক্ষা দেয় তার থেকে উত্তরণের বিকল্প কোনো মাধ্যম এখনো কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। ফোনে সমস্ত ঘটনাটি জানানোর পর সে এইবার যায় পিসিমার খোঁজ নিতে। সেখানে পৌঁছে সে আরো ঘোরতর বিপদের সম্মুখীণ হয়। পিসিমার নিথর দেহ পড়ে আছে। এখন সে কি করবে? যার সুস্থতার খবরটি একটু আগে ফোনে দিয়ে এসছে, এখানে এসে দেখে সে মৃত! পরিবেশ পরিস্থিতি বোধ হয় এইভাবেই লোকের পরীক্ষা নেয়। শিক্ষা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, অহংকার ইত্যাদি একটা সময় ঘটনার কালচক্রে বিবশ হয়ে পড়ে। যেমনটা নির্ণেন্দুর ক্ষেত্রে হয়েছে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের রহস্যকে ভেদ করে কেউ কখনো এগিয়ে যেতে পারে না, তার গবেষণায় শুধু নিত্য নতুন মাত্রা যোগ হয়। অনন্ত কাল ব্যাপী জীবনের এই টানাপোড়েন চলছে, চলতেই থাকবে।

> "মেজদা বললেন, এসেছিস ভালই হল। বুথে চলে যা এস টি ডি করতে হবে। বড়বাবুকে খবরটা দিতে হবে। বলবি, আজ সকালে মার মৃত্যু হয়েছে। আসতে তো এক্ষুণি পারবে না। তবে মৃতদেহ সৎকারের অনুমতি আনবি।"[৫]

পুনর্জীবন :

আলোচ্য গল্পের কাহিনিটি যুবক-যুবতীদের জীবন যন্ত্রণার রূঢ় বাস্তবতাকে নিয়ে লেখা। আমরা সকলেই কর্মহীন ছেলেমেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছি। তারা রুটি রোজগারের আশায় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এখানে সেখানে ইন্টারভিউর খুঁজে ঘুরে বেড়ায়। চারিদিকে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, কর্ম সংস্থানের কোনো উদ্যোগ নেই। এই গল্পেও কর্মহীন ছেলেমেয়েদের টিকে থাকার লড়াইকে দেখানো হয়েছে। জীবন যাপনের জন্য তারা কিভাবে সময়, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় কিংবা পিছিয়ে পড়ে সেই সংঘর্ষটি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের নায়ক অভিজিৎ প্রথম দিকে জীবনের পথকে সহজভাবে মেনে নিয়ে আনন্দ উল্লাসে কাটাতে চেয়েছে। সেই জন্য সে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মজলিশের আড়ালে আসর জমায়। সেই মজলিশে প্রতিদিন আড্ডার আসর জমে ওঠে। কবিতার আসর বসে, খেলাধূলা, রাজনীতি সহ সমাজের নানা বিষয় নিয়ে চর্চা হয়। মেয়েরাও এতে যোগ দেয়। কিন্তু বাসবী এর বিরোধিতা করে। অভির খামখেয়ালি জীবনযাপনের সে প্রতিবাদ করে। অভির মা এই নিয়ে ছেলেকে গালি দেয়। তার সাজানো সুখের দিনগুলির প্রতি যেভাবে তারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অভির তা মোটেও পছন্দ নয়।

ঘটনার ক্রমবিকাশে আমরা লক্ষ্য করি, অভির মা-বাবা দুজনেই চায় সে যেন রাজনীতিবিদ রাজময় করের পরামর্শ মেনে পার্টিতে যোগ দেয়। বাবার সমবয়সি ও বন্ধু বলে তাকে কিছু একটা পাইয়ে দেবে এটা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু শিক্ষিত ছেলে অভি খুব ভালো করেই জানে রাজনীতির আড়ালে তাকে শুধু খাটাবে। প্রতারণার এই ফাঁদে সে পা দিতে চায়নি। তাই সে বলেছে –

> "এরা কোনদিন মানুষের ভালো করে না। হয় ক্ষতি করে, না হয় কাঁধে ভর দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।"[৬]

তার অনুমানই ঠিক, রাজময়ের মতো ধূর্ত লোক ভালো করেই জানে অভিকে কাছে পেলে তার অনেক লাভ। সে নিজের মতো করে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। মিষ্টি কথার জালে জড়িয়ে পার্টিতে সে অনেকটাই উপরে উঠে আসতে পারবে। এর বিনিময়ে অভিকে মিথ্যে আশার ছলনায় ভুলিয়ে রাখবে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন বহু নেতা রয়েছে যারা মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ছলনায় ভুলিয়ে রেখে হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

কাহিনির গতিপ্রকৃতি সেদিকেই এগিয়েছে, যেদিকে প্রতারণার কেন্দ্রে রাজনীতি তার কালো হাত বের করে অভিকে তার দিকে টেনে নেয়। অভির বাবা রণেনবাবু চেয়েছিলেন বাড়ির সামনের খালি জায়গাটাতে একটা মুদির দোকান খুলে দিয়ে ছেলেকে সঠিক পথে আনবেন। সেইমতো পরিকল্পনাও গ্রহণ হয়, কিন্তু দোকান দেওয়ার আগেই সে জমিটি রাজনীতির চক্রান্তে বেদখল হয়ে পড়ে। কে কিভাবে যে এই ষড়যন্ত্রটি করেছে তার উল্লেখ গল্পে না থাকলেও আমাদের কারোরই বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কাজের সন্ধানে নেমে তা সংগ্রহ করা যে কতটা কঠিন তা অভি ভালো করেই উপলব্ধি করেছে, এই কারণেই সে শেষ লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য মিছিলেই পা মিলিয়েছে। কারণ, এছাড়া তার সামনে আর কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না, যার মাধ্যমে সে তাদের বেদখল জমি পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

নির্মল দাশের গল্পে হয়তো যুগান্তকারী সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলি নেই, তবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি স্নিগ্ধ সরলতা। তাঁর গল্পগুলি পাঠকালে বাস্তবতার চেনা পরিচিত চরিত্রগুলিকে অনুভব করা যায়। জীবন যাপনের অসাধারণ লড়াইয়ে তারা যেভাবে টিকে থাকতে চেয়েছে তার স্বরূপটিকে পাঠকের খুবই আপন মনে হয়। তিনি ঘটনার গভীরে পৌঁছেও পাঠককে সে পথ থেকে বেরুনোর রাস্তাটি বলে দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি গল্পের কাহিনি নির্মাণেব ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের অচেনা অলি গলি পথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যেন কেউ হারিয়ে না যায়, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। উপরের নির্বাচিত গল্পগুলিতে আমরা দেখলাম মানুষ কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বা বিপরীত পরিস্থিতিতে পড়েও আবার সেখান থেকে উঠে আসতে পারে। বিচিত্র জীবনের টানাপোড়েনে একটা জায়গায় আটকে থাকলে হবে না, তাকে কাটিয়ে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও কল্পনাশক্তির মেলবন্ধনে গল্পগুলিতে সেই ছবি ও বাস্তবতাকে তুলে ধরলেন।

তথ্যসূত্র :

১. দাশ নির্মল : বিবর্ণ সময়ের কথা, ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৬, পৃ. ৩৮
২. ঐ, পৃ. ৭
৩. ঐ, পৃ. ৯
৪. ঐ, পৃ. ১৫
৫. ঐ, পৃ. ৬২
৬. ঐ, পৃ. ৭৮

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ :

১. দাশ নির্মল : বিবর্ণ সময়ের কথা, ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ঘোষ শুভঙ্কর : কথাশিল্পের বহুমাত্রিকতা, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০২
২. বসু নিমাইসাধন : দেশ কাল মানুষ, পুনশ্চ, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩
৩. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার : গল্প পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৫
৪. চৌধুরী শীতল : বাংলা ছোটগল্পের তিন নক্ষত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৫
৫. চৌধুরী শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১
৬. মুখোপাধ্যায় তরুণ : সময়ের মুখ ও বাংলা সাহিত্য, রচয়িতা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩
৭. সামন্ত সুবল : বাংলা গল্প ও গল্পকার(৩য় খণ্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১৫
৮. প্রামাণিক প্রশান্ত : মহাসময়ের ইতিবৃত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ,এপ্রিল, ২০১৭

অভিধান :

১. আকাদেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮